সুব্রত ঘোষ মোবাইলঃ ৯৫৩১৬১৪৩৪৮ , ইমেল amarlekha2014subrata@gmail.com

একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা :

মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঈশ্বর 'নারী' না 'পুরুষ' এই বিতর্কেও যোগ দিয়েছে। সময়ের নিরিখে এই ধারনার পালাবদল ঘটেছে মাত্র, কিন্তু কোন শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সিদ্ধান্ত যারা নিতে পেরেছেন তারা বিশ্বাস ও তত্ত্বের আলোকে এক একটা ধর্মের এক একটি যুক্তি প্রক্রিয়া তৈরি করেছেন। এবং নিজেদের ঈশ্বরকে নারী বা পুরুষ রূপে, এমনকি পশু, প্রকৃতি, জড়বস্তু, অসীম ইত্যাদি রূপেও কল্পনা করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরাও তাঁদের ধর্ম গড়ে তুলেছেন। এর ফলে আস্তিক-নাস্তিক ধর্ম-বিধর্ম সংঘাত অনিবার্য হয়েছে যেমন, তেমনি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমন্বয় ও স্বীকরণও ঘটেছে। ধর্মের যেমন বিচিত্র গতি, ধর্মের ইতিহাসও ততধিক বৈচিত্রে ভরা।

আমাদের আলোচ্য - শাক্ত ধর্মের মাতৃপূজার অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধান, শাক্ত 'দেবী' কল্পনার দার্শনিক ব্যাখ্যা কী তা দেখা, শাক্ত ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের যোগাযোগকে চিহ্নিত করা এবং সর্বোপরি শাক্ত ধর্মের প্রসারের কালানুক্রমিতাকে বুঝে বাংলায় শাক্ত ধর্মের প্রসার কালকে উপলব্ধি করা। আমরা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি, গবেষণা গ্রন্থ, গৌণ উৎস, গ্রন্থ সারাৎসার ইত্যাদিকে ব্যবহার করে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেছি মাত্র। অনুমান ভিত্তিক নতুন কোন মত বা তথ্য এখানে সংযোজিত হয়নি। প্রাথমিক ধারণা নির্মাণের জন্য আলোচনাটি নির্মিত। পুর্বসিদ্ধান্তগুলিকে ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে। আলোচ্য বিষয়ে বিশদে জানতে পাঠককে আকর গ্রন্থাদির সাহায্য নিতে হবে। আলোচনার ক্রম এইরকম-

১. ১ মাতৃপূজা

১. ২ ভারতে মাতৃপূজা

১.৩ ভারতে পুরুষ দেবতার উত্থান ও মাতৃশক্তি

২.১ ভারতের নানা ধর্ম এবং শাক্ত মত

২.২ শাক্ত ধর্ম

২.৩ শাক্ত ধর্মের প্রসার

১. ১ মাতৃপূজা

আদিম মানুষের কাছে জীবন ও জীবনের রহস্য ছিল অজানা। কিন্তু বংশবিস্তারে 'দ্বিতীয় লিঙ্গে'র অবদান ছিল নিত্য প্রতিভাত। সেই যুগের নীতি নির্ধারক 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' 'নারী'-ই ছিল উৎপাদনের প্রতীক। তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় তখনও 'পুরুষ' জানতে পারেনি। সমাজ বিবর্তনের আদি স্তর থেকে কৃষিজীবী সমাজের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত 'নারী' তাই ধর্মের কেন্দ্রে স্থাপিত ছিল। "আদি কৃষিজীবীদের কল্পনায় জীবন দায়িনী মানবী মাতা ও শস্যদায়িনী পৃথিবী বা বসুমাতা একাকার হয়ে গেছে। মানবিক ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে। মাতৃত্বের দেবী শস্যের দেবীতে রুপান্তরিতা হয়েছেন।"[i] এইকারণেই পৃথিবীর নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা হয়। মাতৃবংশাত্মক ধারাও প্রচলিত ছিল এবং কোথাও কোথাও এখনও বর্তমান আছে । "গ্রীসের রহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্টের ইস্তার, আইসিস প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃ দেবীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।"[ii]

১. ২ ভারতে মাতৃপূজা

ভারতে মাতৃপূজার প্রসার কোন একক জনগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে, এমন দাবী করা যায়না। এই উপমহাদেশে বসবাসকারী নানা গোষ্ঠীর ভূমিকা এক্ষেত্রে স্বীকার্য।[iii] ঐতিহাসিকরা প্রাচীন সুমেরীয়(৫০০০-২০০০খ্রীঃপূঃ), ব্যবিলনিয়(২০০০-৫০০খ্রীঃপূঃ) ও সিন্ধু(৩০০০-১৫০০খ্রীঃপূঃ) সভ্যতার সংযোগের নিদর্শন পেয়েছেন। আনুমানিক ৩০০০খ্রীঃপূঃ-এ সুমেরীয় সভ্যতা মাতৃদেবী 'তাম্মুজ'-এর পূজা করত। বিপরীতে আনুমানিক ২০০০খ্রীঃপূঃ-এ পুরুষ দেবতা 'মারদুক'-এর উপাসনা শুরু হয় ব্যবিলনে। বালুচিস্তানের 'ঝোব' ও 'কুল্লি' উপত্যকার সংস্কৃতি থেকে পরবর্তী 'হরপ্পা–মহেঞ্জোদারো' সংস্কৃতি পর্যন্ত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক মাতৃকামূর্তি ও অনান্য নিদর্শন সমূহ থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন ২৫০০খ্রীঃপূঃ-এ সিন্ধু উপত্যকায় "আদিম উর্বরতামূলক বিশ্বাসসমূহ" সমাজে কার্যকর ছিল। নানা 'শীল'(পোড়া মাটির তৈরি,দুদিকেই ছাপ যুক্ত)-এ এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক অস্ট্রিক্ ও দ্রাবিড় সংস্কৃতিতেও মাতৃপূজার স্বাক্ষর মেলে। মনে করা হয় সেইসব প্রাচীন মাতৃরূপই বিবর্তিত হয়ে পরবর্তীকালে আসমুদ্রহিমাচলের নানা 'মাতৃশক্তি'রূপে 'হিন্দু'(সিন্ধু > ইন্দু > হিন্দু) ধর্মে পুজা পেয়ে আসছে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় পালাবদল (কৃষিকাজ-পশুপালন), নাগরিক জীবন যাপনের প্রসার ও সন্তান উৎপাদনে পুরুষের ভূমিকা স্বীকৃত হওয়ার কারণে ধর্মে ক্রমেই মাতৃপ্রাধান্য কমতে থাকে। সপ্তসিন্ধুদেশ(অর্থাৎ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে)-এ 'লিঙ্গ' পূজার বহুল প্রচলন এরই সাখ্য বহন করে। আরও পরে "পিতৃতান্ত্রিক পশুপালক বৈদিক সমাজের যে ধর্মব্যবস্থা সেখানে দেবীদের স্থান নেই বললেই হয়।"[iv]

১.৩ ভারতে পুরুষ দেবতার উত্থান ও মাতৃশক্তি

পশুপালন নির্ভর যাযাবর ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর[1] মানুষ লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত। তাদের সংহত আক্রমণের সামনে সিন্ধু উপত্যকার পরস্পর বিবাদমান গোষ্ঠীগুলির কৃষিজীবী-গৃহস্থ-মানুষ দাঁড়াতে পারেনি। জয়লাভ করে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মানুষ ভারতে যজ্ঞবেদির সংস্কৃতি বা বৈদিক সভ্যতার(১৫০০-৬০০খ্রীঃপূঃ) বিস্তার ঘটায়। মনে রাখতে হবে, ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী আসার আগে থেকেই সপ্তসিন্ধুদেশে 'দাহি' বা 'দাস'-দের সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। যারা যজ্ঞ করত মন্দিরেই । কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর যাযাবর মানুষ অস্থায়ী তাঁবু বা শামিয়ানার নিচে যজ্ঞ করতে বাধ্য হত, তারা 'দাহি' বা 'দাস'-দের "চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করেন। যাগযজ্ঞ করিতে হইলে তাহা মণ্ডপেই করিতে হইবে, আর্যরা এই নূতন প্রথা প্রবর্তন করিলেন। আর তাহাদের বংশধররা তাঁবুতে থাকা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে গৃহে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মণ্ডপ ব্যতীত যজ্ঞ করা চলে না এই নিয়ম অদ্যাবধি বর্তমান আছে।"[v]

"পশুপালন নির্ভর সমাজ পুরুষ প্রধান, অতএব পশুপালকদের চেতনাতেও পুরুষ প্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে তাই দেবীদের তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য।"[vi] 'দ্যুলোক'(স্বর্গ), 'অন্তরীক্ষ'(আকাশ) ও 'ভূলোক'(মর্ত্য)–এর দেবতারা তাই প্রায় সকলেই পুরুষ; -যথা 'মিত্র', 'পুষা', 'বিষ্ণু', 'আদিত্যগণ', 'ইন্দ্র', 'রুদ্র', 'বায়ু', 'বরুণ', 'অগ্নি', 'সোম' প্রমুখ। সূর্যদেবতা 'সবিতা' ও 'বিষ্ণু' এবং স্বয়ং 'রুদ্র' হলেন পুরুষ। বিপরীতে 'ঊষা', 'অদিতি', 'পৃথ্বী' প্রমুখ গৌণ দেবী। গুরুত্বপূর্ণ দেবী 'সরস্বতী' –পুরুষ দেবতাদের পাশে একমাত্র এই 'বাগদেবী'ই পুজা পেতেন। আর "In the male-dominated pantheon of the Vedas there was another group of goddesses, who had achieved their status only by virtue of their relation with the male gods.

[1] 'আর্য' নামেই যারা ভারত ইতিহাসে পরিচিত।

They were known as the 'devanam patnih'. Indra's wife was Indrani, Varuna's Varunani, the names of the deities being fashioned from those of their husbands."[vii] অর্থাৎ দেবী বলতে ছিলেন পুরুষ দেবতাদের 'স্ত্রী'রা।

দাস, ইন্দো-ইউরোপীয়, অস্ট্রিক্ এবং দ্রাবিড় –একাধিক সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় অচিরেই ঋগ্বেদ-পরবর্তী বৈদিক সমাজ ও সাহিত্যে প্রাক-বৈদিক সমাজের 'মাতৃশক্তি' নব নব রূপে জায়গা পেতে শুরু করল। যাদের মধ্যে 'অম্বিকা', 'দুর্গা', 'কাত্যায়নী', 'কন্যাকুমারী', 'শ্রী', 'কালী' পরবর্তীকালের ধর্মে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।[viii] নতুন ব্যবস্থায় একদা-অন্ত্যজ দেবীরাও ব্রাহ্মণের পূজায় উচ্চাসন লাভ করল।

২.১.১ ভারতের নানা ধর্ম এবং শাক্ত মত

ইতিমধ্যে প্রাচীন 'গোষ্ঠীজীবন' থেকে 'বর্ণভিত্তিক সমাজ' ব্যবস্থার প্রচলন সমাজে একটা বড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। তার চেয়েও বড় পরিবর্তন 'ব্রাহ্মণ'-এর ক্ষমতার হস্তান্তর। সপ্তসিন্ধু দেশে পুরোহিতরাই রাজার ভূমিকা পালন করত। ইন্দো-ইউরোপীয়রা আসার পর ক্ষত্রিয়দের গুরুত্ব বাড়ল। 'রাষ্ট্র' ভাবনার উৎপত্তি 'গোষ্ঠীপতি', 'গোত্রপতি'র স্থানে 'রাজা'কে অভিষিক্ত করে জন্ম দিল 'রাজতন্ত্রে'র। ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা বৃদ্ধিতে 'ক্ষমতা'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই চরম শক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে[2] 'রাজা'ই জনগণের পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন। রাজা আর ঈশ্বরের কোন পার্থক্য থাকল না। ক্ষমতা হারালেও 'ব্রাহ্মণ'রা পদমর্যাদায় ও সম্মানে সবচেয়ে উপরের স্তরে থেকে গেলেন। এবং উপঢৌকন পেয়ে রাজার ন্যায়-অন্যায়কে করলেন শাস্ত্রসম্মত। মন দিলেন সাহিত্য সৃষ্টিতে। বর্ণ বিভাজন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) বংশানুক্রমিক হয়ে গেল। কায়েম হল একেশ্বরবাদী ধর্মমত। ভারতে এই ভাবেই বৈদিক যুগের পরে আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে একেশ্বরবাদী 'বৈষ্ণব' ও 'শৈব' ধর্মের জয়যাত্রা শুরু।[ix]

বৈদিক যুগে "... যাগযজ্ঞের চারিদিকে দেখা যেত গান-বাজনা- উৎসবের সমারোহ। সে যুগে সন্ন্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতির ধার তাঁরা ধারেন নি। ধর্মের জন্য পশুঘাতও তাঁদের বেশ চলত। ক্রমে উপনিষদের যুগে দেখি দেবতার স্থানে আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাস

[2] বৈদিকোত্তর যুগে 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ 'রাজা'কে সৃষ্টি দেবতা প্রজাপতির অবতার এবং 'অথর্ববেদ'-এ 'রাজা'কে 'ঈশ্বর' মনে করা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। ধনজনের কামনার স্থানে এল বৈরাগ্য, স্বর্গের বদলে ক্রমে তাঁরা চাইলেন মুক্তি। ধর্মার্থ পশুঘাতের স্থলে এল অহিংসা মৈত্রী। মানুষ ও মানবদেহের মহত্ত্ব, মানবের মধ্যে বিশ্বপ্রেমে ভক্তিতে সাধনা প্রভৃতি দেখা দিল।"[x] এরপরের ইতিহাস 'বৌদ্ধ' ও 'জৈন' ধর্মের উত্থানের ইতিহাস।

'বৈষ্ণব', 'শৈব', 'বৌদ্ধ' ও 'জৈন' ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির যুগে যে ধর্মমতটি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল তা আমাদের আলোচ্য 'শাক্ত'ধর্ম।

প্রাচীন কাল থেকেই শাক্ত দর্শন ভারতের অন্য ধর্মগুলিকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মে এমনকি পরবর্তী কালের বৌদ্ধ ধর্মেও আমরা তাই শাক্ত সাধনার নানা আচার আচরণের হুবহু কিম্বা আংশিক অনুকরণ দেখে থাকি।

২.১.২ শাক্ত ধর্ম

শাক্তধর্ম মতে তিনিই শাক্ত যিনি 'শক্তি'র উপাসনা করেন। যে 'শক্তি'র আধার কোন পুরুষ নন, নারী। পরব্রহ্ম 'দেবী'ই এক এবং অদ্বিতীয়। অন্য সব দেব-দেবীই সেই 'শক্তি'দেবীর অধীন। প্রাণীকুলের জীবন যাপনের তিনিই কারণ।

মূলত প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বই শাক্তধর্মের আশ্রয়। শাক্তধর্মে 'তন্ত্র' ও 'সাংখ্য দর্শনে'র প্রভাব অপরিসীম। "জীব সৃষ্টির মূলে নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক বর্তমান, এই মূল ধারনার যে দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক অভিব্যাক্তি তন্ত্রে ও সাংখ্যে ঘটেছে তা প্রাক বৈদিক এবং বেদ বিরোধী।"[xi] তন্ত্র মতে পুরুষ ও নারী উভয় আদর্শের সংযোগেই সৃষ্টির লীলা । তবে গুরুত্বে নারীই শ্রেষ্ঠ।[xii] "নারী সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরুপা ভগবতী, তাকে তুষ্ট করলেই দেবী তুষ্ট হন।"[xiii] সাংখ্য মতে "এই বস্তুভিত্তিক বিশ্ব চরাচর যদি একটি কার্য হয় তার কারণও বস্তু সর্বস্ব হতে বাধ্য। প্রকৃতি সেই সর্বাদিতম বস্তুসত্তা যার বিবর্তনে সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে।....সাংখ্যের প্রকৃতি নারীরুপে কল্পিতা।"[xiv] তাই শাক্ত ধর্ম ও তন্ত্র আলাদা নয়। শাক্ত-তান্ত্রিক ভাবধারায় "স্বয়ং আদ্যাশক্তি তাঁর নিজ দেহ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করেন এবং তারপর নিজেকে ত্রিধাবিভক্ত করে তাঁদের সহচরী হন, যার ফলে জগৎ ও জীবনের উদ্ভব।"[xv]

২.১.৩ জাতিভেদ, তন্ত্র ও শাক্তসাধনা

আলোচনার শুরুতে বর্ণিত প্রাচীন মাতৃপূজার ধারাটির প্রবহমান সংস্কৃত রূপ হল এই তন্ত্র ও শাক্ত সাধনা। শাক্ত ধর্ম হাজার হাজার বছর বহন করে এসেছে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ । গুরুমুখী এই সাধনার গুরুরাও ছিলেন অন্ত্যজ। এর কারণ হিসেবে আমরা জাতিভেদ প্রথাকে চিহ্নিত করতে পারি।

"বেদকালের পূর্বেও সপ্তসিন্ধুদেশে এবং মধ্যভারতে অহিংসা ধর্মের মত জাতিভেদ-ধর্মও বিদ্যমান ছিল।...কিন্তু জাতিভেদের এই দুরবস্থা ঘটে নাই।"[xvi] এমনকি বুদ্ধের জন্মের পরে রচিত উপনিষদের যুগে ঋষিরা যে সত্যকে জাতিভেদের উপরে জায়গা দিতেন তার প্রমাণ জবালা-সত্যকামের গল্প। মনু ('মনুসংহিতা'-আনুঃ২০০খ্রীঃপূঃ-২০০খ্রীঃ) ও আদি শঙ্করাচার্যর(৭৮৮-৮২০খ্রীঃ) হাতেই জাতিভেদ নির্মম হয়ে ওঠে। শূদ্রের বেদ পাঠের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্যের অজুহাত তাদের করে তোলে করুণার পাত্র। ব্রাহ্মণরাই হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ । চরম নিধানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের তলায় হল শূদ্রদের স্থান। বৈশ্য ও শূদ্রের সামাজিক অবস্থান বোঝাতে মনু একটা আলাদা অধ্যায়(বৈশ্য ও শূদ্রের ক্রিয়া কর্তব্য ৯.৩২৫-৩৬)-ই যোগ করেন। পরবর্তী কালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে গ্রিক, শক, হূণ, মালব, গুর্জর ইত্যাদি ভিনদেশীয় জাতিরাও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমনকি ব্রাহ্মণ পর্যন্ত হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করল। তবু অস্পৃশ্যরা সমাজে অপাংতেয়ই থেকে গেল। জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণদের ভিক্ষাই ছিল সম্বল। অথচ সমাজে জাতিভেদ বর্তমান। জৈন ও বৌদ্ধ সঙ্ঘে জাতিভেদের স্থান না থাকলেও শ্রমণরা চার শ্রেণির কাছ থেকেই ভিক্ষা নেওয়ার কারণে সমাজের চোখে নিন্দার পাত্র হয়ে গেল। তারা ভারতে আর টিকে থাকতে পারল না। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে গেল। সমাজের জাতিভেদ ব্যবস্থার পরিবর্তন হল না।[xvii]

ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠিন নিয়মে জ্ঞান-আচার-বিদ্যায় শূদ্র ও নারীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। তন্ত্রসাধনায় এমন বিধিনিষেধ না থাকার কারণে নারী, শূদ্র ও অন্ত্যজরা প্রায় গোপণেই নিজেদের সাধনার জন্য 'তন্ত্র'কে বেছে নিল। আরও একটা বিষয় সমাজে ঘটছিল- জীবনের প্রয়োজনেই ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর পুরুষরা বাধ্য হচ্ছিল অস্ট্রিক্ এবং দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মেয়েদের বিবাহ করতে। যার ফলে ব্রাহ্মণরা বাধ্য হল এই সমস্ত গোষ্ঠীর ধর্মের ব্যাপারগুলি বুঝে নিয়ে নিজেদের মত পরিবর্তন সাধন করতে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সুচতুর ছোঁয়ায় 'শাক্তধর্ম' ও 'তন্ত্রে' বেশকিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন করে বেদান্তের প্রচ্ছন্ন প্রলেপ লাগিয়ে সাংখ্যদর্শনের পুরুষের ধারনায় 'ব্রহ্ম' ও 'শিব'

কে যুক্ত করেছিল, তেমন করেই শাক্ত ধর্মে বৈদান্তিক ‘দ্বৈত ও অদ্বৈত মতবাদ’কে জায়গা করে দিল। “তন্ত্রের ভাববাদী রুপান্তর হাল আমলের, অর্থাৎ আদিমধ্য ও মধ্যযুগের, যখন থেকে বৈদান্তিকরা তন্ত্র ও শাক্ত ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়ে তন্ত্র মূলত বস্তুবাদী ও লোকায়তিক চরিত্রের অধিকারী ছিল।”[xviii]

২.১.৪ তন্ত্র ও শাক্ত সাধনা

তন্ত্র কোন ধর্ম নয়। সাধন পদ্ধতি মাত্র। “তন্ত্রকে একটি গুহ্য শাস্ত্র(mystic doctrine) বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতদীক্ষিত ও অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এই শাস্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে : ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপন প্রাণ পর্যন্ত দেবে কিন্তু গুহ্যশাস্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করবে না। শিবের স্ত্রী বা দেবী একটি বিশেষ শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে কার্যকরী করেছে।”[xix]

সাধারণ মানুষ ‘ষড় রিপু’ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য)-র অধীন। তাই সে ‘বদ্ধজীব’। তখন সে ‘পশু’। অনেক চেষ্টায় সেই ‘বদ্ধজীব’ নিজেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিয়ে আসে। তখন সে ‘পশু’ থেকে হয় ‘বীর’। এই বীর’পর্যায়ে পোঁছেই ‘দক্ষিণাচারে’ ও ‘বামাচারে’ তন্ত্রসাধনায় সম্মতি মেলে। দক্ষিণাচারে জ্ঞান ও ভক্তিই সাধকের আশ্রয়। পরবর্তী পর্যায়ে সাধক বামাচারী, তখন সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার যোগ্য। এই স্তরেই সাধকের আশ্রয় তন্ত্রের ‘পঞ্চতত্ত্ব’ । এইভাবে সাধক ‘দিব্য’ স্তরে পৌঁছয়। তখন তাঁর ‘সিদ্ধান্তচার’ ও ‘কৌলাচারে’ দীক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা আয়ত্তে আসে।

‘পঞ্চতত্ত্ব’ ও ‘ষটচক্রভেদ’ তন্ত্রসাধকের পরম আশ্রয়। কেননা তন্ত্র দর্শনের রহস্য এই দুই সাধন পদ্ধতিতে লুকিয়ে আছে। বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী ও কৌলাচারী স্তরে সাধকের এই সাধনায় অধিকার জন্মায়। শিব-শক্তির রূপকে সাধক ও সাধন সঙ্গিনীর মিলন হল ‘পঞ্চতত্ত্ব বা ‘পঞ্চমকার’(মৈথুন, মুদ্রা, মাংস, মৎস্য, মদ্য) সাধনা। ‘ষটচক্রভেদ’ আসলে একধরণের ক্রিয়া যার দ্বারা মানব দেহস্থিত ‘কুণ্ডলিনী’ শক্তিকে ‘মূলাধার’ থেকে পর্যায়ক্রমে ‘স্বাধিষ্ঠান’, ‘মণিপুর’, ‘অনাহত’, ‘বিশুদ্ধি’, ‘আজ্ঞাচক্র’-এর পর ‘সহস্রারে’ উন্নীত করার চেষ্টা করেন সাধক।[xx] এর ফলেই শিবশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির মিলন।

তন্ত্রে গুরু ও মন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম। নারী পুরুষ যে কেউ গুরু হতে পারে। গুরুর জাত-কুলও দেখলে চলবে না। শুধু যোগ্যতাই বিচার্য। গুরুর দীক্ষায় পুনর্জন্ম হয়। কারণ গুরুই শক্তি। মন্ত্রের

রহস্য লুকিয়ে আছে ১৬ টি স্বরবর্ণ ও ৩৫ টি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তিতে। কারণ "ধ্বনির প্রকাশ হয় বর্ণে বা অক্ষরে, এবং বর্ণ বা অক্ষরই বীজ। বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা ও তাঁদের থেকেই সিদ্ধ বীজ মন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। হ্রিং ক্রিং ঐং শ্রীং ক্লীং প্রভৃতি বীজ। .....সমুদয় তত্ত্ব ওই একাক্ষরা বীজের মধ্যে বর্তমান। বর্ণমালাই মাতৃকা। পঞ্চাশটি বর্ণ মাতৃকাবর্ণ, দেবী সরস্বতীর অক্ষমালা বা দেবী কালীর মুণ্ডমালা।"[xxi]

বাঙালি শাক্ত কবিদের তন্ত্র মতে শাক্ত সাধনার রহস্য এই যে তাঁরাও তন্ত্র আর শাক্ত সাধনার তফাৎ করেননি। কার্যত তন্ত্র সাধনা আর শাক্তসাধনা একই। দার্শনিক প্রশ্নে শাক্ত দর্শনের আশ্রয় ছিল সাংখ্য দর্শন। কালে কালে ব্রাহ্মন্যবাদের হাতে পড়ে তন্ত্র ও শাক্ত দর্শনের পরিবর্তন হয়। বৈদান্তিক দ্বৈত ও অদ্বৈত মতবাদ দ্বারা শাক্ত ধর্ম প্রভাবিত হয়। শাক্ত দর্শনের মূল কথা হল, " চরম সত্ত্বা, যা দেশ, কাল ও কারনাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরুপ, প্রকাশরূপে বর্তমান। বিমর্শশক্তি এই প্রকাশেরই ক্রিয়া সম্পর্কীয় স্বাতন্ত্র্য, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি তাঁর স্বরুপ অর্থাৎ চরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। তাঁরই মধ্যে নিহিত, এবং তাঁরই অবিচ্ছেদ্য গুণরূপে প্রকাশিত। শক্তির দুটি অবস্থা আছে – নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন বলা হয় যে বিমর্শ প্রকাশে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু শক্তি যখন জাগ্রত তখন চরম সত্তাও স্বয়ং চেতন হন। তখন তাঁর আত্ম জ্ঞান অহমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বিশ্বজগৎ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় এই অহমে প্রতিফলিত হয়। চরমসত্তা যার প্রকাশ শিব এবং বিমর্শ শক্তি, একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত। দুয়ে মিলে এক অখণ্ড সত্ত্বা। .....এই চরম সত্তার সঙ্গে শক্তি বা কলা চিরকালীন ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন।"[xxii]

২.১.৫ শাক্ত দেবদেবী

শাক্তরা কেবল দেবী পূজা করেন। শিব এখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে মাত্র। অম্বিকা, উমা, কাত্যায়িনি, কন্যাকুমারী, দুর্গা, কালী, করালি, ভদ্রকালী, চণ্ডী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, গৌরী, পার্বতী, কৌশিকী, অভয়া ইত্যাদি কত না নামে শাক্তর আরাধ্যা পরিচিতা। একাধিক রূপ হলেও 'শক্তি'ই সকল কারণের কারণ। 'দেবীভাগবত'-এ স্বয়ং দেবী বলছেন:

"আমিই প্রত্যক্ষ দৈবসত্ত্বা, অপ্রত্যক্ষ দৈবসত্ত্বা, এবং তুরীয় দৈবসত্ত্বা। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; আবার আমিই সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতী। আমি সূর্য, আমি নক্ষত্ররাজি, আবার আমিই চন্দ্র। আমিই

সকল পশু ও পাখি। আবার আমি জাতিহীন, এমনকি তস্করও। আমি ভয়াল কর্মকারী হীন ব্যক্তি; আবার আমিই মহৎ কার্যকারী মহামানব। আমি নারী, আমি পুরুষ, আমিই জড়।"[xxiii]

উপনিষদের অম্বিকা, উমা, হৈমবতী , কালী, করালি বাংলার শাক্ত কবিদের ভাবনায় কেউ বা ঘরের 'মেয়ে' কেউ বা 'মা' ।"আমাদের শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা; আমরা দক্ষ কন্যা সতীকে পাই – তিনিই আবার দশ-মহাবিদ্যা রূপে রুপান্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে আবার তাহাঁর একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই আমরা কালিকা বা কালী-দেবীকে – শাক্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুরাণ- তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত অভিন্ন রূপে দেবীর আরও অনেক রুপভেদ আছে, শাক্ত-ধর্ম ও –সাহিত্যের মধ্যে তাহাঁদের উল্লেখ রহিয়াছে"।[xxiv]

বাংলাদেশে মূলত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই শাক্ত ধর্মের দার্শনিক উপলব্ধির কিছু পরিবর্তন হয়। "শক্তির অধিষ্ঠাত্রী খড়গধারিণী, মুণ্ডমালিনী দেবী বরাভয়দাত্রীরূপে সাধক কবির চোখে ধরা দিলেন। বৈষ্ণবেরা ভীষণত্ব অস্বীকার করিলেন – শাক্ত সাধক কবি ভীষণত্ব ও মাতৃত্ব উভয়ই গ্রহণ করিলেন।"[xxv]

২.৩.১ শাক্ত ধর্মের প্রসার

সেই সুদূর প্রাকবৈদিক কাল থেকে তন্ত্র ও শাক্তধর্ম নিজেকে যুগের প্রয়োজনে বার বার বদলেছে বলেই এতকাল সে পথ চলতে পেরেছে। বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন কোন ধর্মই প্রাচীন তন্ত্র ধারাকে অস্বীকার করতে পারেনি। অর্বাচীন কালের বাউলের ধর্ম-ও একে এড়াতে পারেনি। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধরাও 'তারা', 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'একজটা' দেবীর কল্পনা করেছে। বৈষ্ণব ধারায় তন্ত্রের প্রবেশে একসময় 'লক্ষ্মীতন্ত্র' গ্রন্থে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর চেয়েও বড় করে সর্বোচ্চ শক্তির স্থানে বসানো হয়েছে। একটা বড় সময়কাল শাক্তধর্ম শৈবধর্মের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বর্তমানে শাক্ত ধর্মের দুটি উপসম্প্রদায় বৃহত্তর জন মানসে ক্রিয়াশীল: একটি দক্ষিণ ভারতের শ্রীকুল এবং আর একটি উত্তর ও পূর্ব ভারতের কালীকুল।

২.৩.২ প্রসারের পর্ব

গুপ্ত যুগেই শাক্ত ধর্ম সমাজে একটা বড় জায়গা করে নিল। গুপ্ত যুগে সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব রচিত হয়। এই সময়েই তন্ত্র ও মাতৃসাধনা মিলে শক্তি ধর্মকে নতুন রূপ দেয়। ৫০০-৯০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কাল শাক্ত ধর্ম প্রসারের কাল।

২.৩.৩ বাংলায় শাক্ত ধর্মের প্রসার

বাংলায় তন্ত্র সাধনার ইতিহাস প্রায় দেড়হাজার বছরের। অনেকের মতে বাংলাদেশই শাক্ত ও তন্ত্র পীঠস্থান।[xxvi] বাংলায় পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মই প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার মহাযান পন্থী বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্রের প্রভাব ছিল। তার প্রমাণ 'চর্যাপদ'-সেখানেও আমরা তন্ত্র সাধনার ইঙ্গিত পেয়ে থাকি। সেন রাজত্বে হিন্দু ধর্ম আবার জনমানসে জায়গা করে নেয়। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এরপর ভিন্নগতিতে বয়েছে। বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতেই শাক্ত ধর্মের প্রসার হয়। 'মালসী গান' তারই ফসল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার পরিপূর্ণ বিকাশ। রামপ্রসাদ(১৭২০-১৭৮১) ও কমলাকান্ত(১৭৭২-১৮২১)-র শাক্ত সঙ্গীত এর প্রমাণ। উনবিংশ শতক থেকে 'শাক্ত পদাবলী' একটা স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নেয়। আমরা যে শাক্ত পদাবলীর আলোচনা করে থাকি তার বৃহৎ অংশই উনবিংশ শতকের রচিত।

**শেষকথা

বাংলার শাক্ত ঐতিহ্যকে বুঝতে যে দীর্ঘ পথ আমরা পেরিয়ে এলাম তা নিয়ে এখনও শেষ কথা কেউ বলে উঠতে পারেনি। ইতিহাসকে বোঝার ও তাঁকে বিশ্লেষণ করার নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অতীতকে প্রতিদিন অন্যরূপে হাজির করছে আমাদের সামনে। এই প্রবন্ধ বাংলাদেশে কালী ও দুর্গাপূজা এবং শাক্ত পদাবলী রচনার ইতিহাস আলোচনার সামান্য গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

তথ্যসূত্র

[i] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ৪

[ii] ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত, ১৩৬৭, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১০-১১

[iii] The Development of Mother Goddess Worship, Vijaylakshmi Chaudhuri, 1987, Visva-Bharati, Page no: Preface-X

[iv] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ৩১

[v] ভগবান বুদ্ধ, ধর্মানন্দ কোসম্বি, ২০১১, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃ. ৩

[vi] ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৫২, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫৬

[vii] The Development of Mother Goddess Worship, Vijaylakshmi Chaudhuri, 1987, Visva-Bharati, Page no: 20

[viii] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ৭৬

[ix] 'ঐ', পৃ. ১৭৫

[x] বাংলার সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৫২, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৪৪

[xi] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ৩৩

[xii] 'ঐ', পৃ. ১৪০

[xiii] 'ঐ', পৃ. ৩৭

[xiv] 'ঐ', পৃ. ৩৫

[xv] 'ঐ', পৃ. ২১৮

[xvi] ভগবান বুদ্ধ, ধর্মানন্দ কোসম্বি, ২০১১, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৬৮

[xvii] 'ঐ', পৃ. ১৮২-১৮৩

[xviii] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ২৩৬

[xix] পৌরাণিক অভিধান, সুধিরচন্দ্র সরকার, ১৪১৮, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৯২

[xx] ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২০১৪, জেনারেল, কলকাতা, পৃ. ২২৭-২৩০

[xxi] 'ঐ' পৃ. ২২৮

[xxii] 'ঐ' পৃ. ২৩৫-৩৬

[xxiii] শ্রীশ্রীদুর্গা: তত্ত্বে ও কাহিনীতে, স্বামী অচ্যুতানন্দ, ২০০৭, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১১৩

[xxiv] ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত, ১৩৬৭, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১

[xxv] শ্যামা সঙ্গীত সংগ্রহ, রামরেণু মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৯, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃ. নিবেদন অংস-১

[xxvi] বাংলার সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৫২, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৪৬